আন্তর্জাতিক সম্পর্ক বিষয়ক গবেষণায় সিদ্ধান্ত প্রণয়ন কাঠামো ও বিষয় বিশ্লেষণ

মোঃ আবদুল হালিম*

ভূমিকা

আন্তর্জাতিক সম্পর্ক অধ্যয়নের উদ্দেশ্য হল রাষ্ট্র কখন সহযোগিতামূলক আচরণ প্রকাশ করে এবং কখন আক্রমণাত্মক মনোভাব পোষণ করে তা' সঠিকভাবে উপলব্ধি করা। যেহেতু রাষ্ট্র শুধুমাত্র বিমূর্ত সত্তা এবং সিদ্ধান্ত প্রণেতাদের কার্যাবলীর মাধ্যমেই তার আচরণ প্রকাশ পায় তাই আন্তর্জাতিক সম্পর্কের অধ্যয়নে তাঁদের কার্যধারা বিশ্লেষণ অত্যাবশ্যক। এদিক থেকে বিচার করলে আন্তর্জাতিক সম্পর্কের অধ্যয়নে সিদ্ধান্ত প্রণয়ন যে শুধুমাত্র একটি গুরুত্বপূর্ণ দিক তাই নয়, সাম্প্রতিক বছরগুলোতে তাত্ত্বিকদের বৈজ্ঞানিক অনুসন্ধানের একটি প্রধান আকর্ষণের কেন্দ্রবিন্দুও বটে।

বর্তমান বিশ্বে বিভিন্ন ধরনের জটিলতা ও রাষ্ট্রসমূহের মাঝে ক্রমবর্ধমান পারস্পরিক নির্ভরশীলতা বৃদ্ধি পাবার ফলে এখন আর কোন দেশের পক্ষেই বিচ্ছিন্ন থাকা সম্ভব নয়। সব রাষ্ট্রেরই কোন না কোন প্রয়োজন মেটাতে বহির্বিশ্বের সাথে সম্পর্ক রক্ষা করে চলতে হয়। পররাষ্ট্র নীতির মাধ্যমেই এ ধরনের সম্পর্ক বজায় রাখা হয়। পররাষ্ট্র নীতি পরিচালনার ব্যাপারে সিদ্ধান্ত প্রণেতাগণ বিশেষ ভূমিকা পালন করেন। বস্তুতঃপক্ষে সিদ্ধান্তের গুণাবলীর উপরই পররাষ্ট্র নীতির সার্থকতা অথবা ব্যর্থতা অনেকাংশে নির্ভর করে। সিদ্ধান্তের গুণাবলী আবার অনেকগুলো উপাদানের উপর নির্ভরশীল। আন্তর্জাতিক সম্পর্কের পন্ডিত ও গবেষকগণ এ উপাদানগুলো অনুধাবন করতে ইচ্ছুক এবং তাঁদের সাম্প্রতিক গবেষণার অনেকটা মনোযোগ উন্নত সিদ্ধান্তের শর্তাবলী উন্মোচনের দিকেই নিবিষ্ট করেছেন। যদিও তাঁদের মূল লক্ষ্য এতদসম্পর্কিত তত্ত্ব উদ্ভাবন করা, তবুও যতদিন পর্যন্ত এটা সমাধা করা সম্ভব না হয় তাঁরা নিশ্চেষ্ট হয়ে বসে নেই। ইতিমধ্যেই তাঁরা সিদ্ধান্ত প্রণয়নের অনেক মডেল তৈরী করেছেন। বর্তমান নিবন্ধের উদ্দেশ্য হল এ সকল মডেল সম্বলিত সিদ্ধান্ত–প্রণয়নের কাঠামো সম্পর্কে ধারণা দেয়া। একই সাথে সিদ্ধান্ত–প্রণয়ন, বিশেষতঃ সংকটকালীন সিদ্ধান্ত প্রণয়ন, কিভাবে হয় তা'

*সহযোগী অধ্যাপক, আন্তর্জাতিক সম্পর্ক বিভাগ, ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়

বৈজ্ঞানিক উপায়ে পরীক্ষা করে দেখার সুবিধার্থে উপাত্ত সংগ্রহের পদ্ধতি হিসেবে বিষয় বিশ্লেষণ সম্পর্কেও এখানে আলোচনা করা হয়েছে।

নিবন্ধটির শুরুতেই সিদ্ধান্ত–প্রণয়নের সংজ্ঞা প্রদান করা হয়েছে। এরপর সিদ্ধান্ত–প্রণয়নের কাঠামোকে বুঝানোর জন্য এতদ্‌সম্পর্কিত বিভিন্ন মডেল সম্পর্কে আলোচনা করা হয়েছে। এখানে একটি কথা স্মরণ রাখা দরকার যে, সিদ্ধান্ত প্রণয়ন সম্পর্কিত গবেষণা এখন পর্যন্ত পরিপূর্ণ তত্ত্বের মর্যাদা অর্জন করতে পারেনি। তাই আমরা ধারণাগত কাঠামো (conceptual framework) কথাটি ব্যবহার করব যার মধ্যে অনেকগুলো মডেলকে অন্তর্ভুক্ত করা হবে। পরিশেষে বিশেষত সংকটকালীন পরিস্থিতিতে সিদ্ধান্ত–প্রণয়ন সম্পর্কিত গবেষণার সুবিধার্থে উপাত্ত সংগ্রহের ক্ষেত্রে একটি কৌশল হিসেবে বিষয় বিশ্লেষণের প্রাসঙ্গিকতা প্রতিষ্ঠিত করে এ ব্যাপারে যে পদ্ধতি অবলম্বন করা হয় এবং যে সকল সমস্যার সম্মুখীন হতে হয় তার একটি সংক্ষিপ্ত বিবরণ প্রদান করা হয়েছে।

সিদ্ধান্ত—প্রণয়ন কি?

সিদ্ধান্ত–প্রণয়নকে সংক্ষেপ অনেকগুলো ব্যবহারযোগ্য বিকল্প থেকে বেছে নেয়া বলা যেতে পারে যেখনে এগুলোর কার্যকারিতার ব্যাপারে কিছুটা অনিশ্চয়তা বিদ্যমান থাকে। জাতীয় রাজনীতির চেয়ে আন্তর্জাতিক রাজনীতির ক্ষেত্রে, বিশেষতঃ পররাষ্ট্র নীতির সিদ্ধান্ত প্রণয়নের ব্যাপারে, অনিশ্চয়তা আরও বেশী থাকে কারণ অন্যান্য দেশ কি করবে সে সম্পর্কে নিশ্চিত হওয়া অত্যন্ত দুঃসাধ্য।

আন্তর্জাতিক রাজনীতি অনুধাবনের ক্ষেত্রে সিদ্ধান্ত–প্রণয়ন পদ্ধতিটি অভিনব ব্যাপার নয়। দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের পর থেকে সিদ্ধান্ত প্রণয়নের ব্যাপারটি সামাজিক বিজ্ঞানের বিভিন্ন শাখায় পন্ডিতদের দৃষ্টি আকর্ষণ করে যদিও এ ধারণাটি কূটনৈতিক ইতিহাসের নানা বর্ণনায় ও সরকারী কার্যকলাপের মধ্যে বহু পূর্ব থেকেই প্রচলিত ছিল। উদাহরণ স্বরূপ বলা যেতে পারে যে, প্রায় আড়াই হাজার বছর পূর্বে গ্রীক ঐতিহাসিক থুকিদিদিস (Thucydides) তাঁর বিখ্যাত *The Peloponnesian War* নামক গ্রন্থে বিভিন্ন নগররাষ্ট্রের নেতৃবৃন্দের যুদ্ধ ও শান্তি, মৈত্রীজোট ইত্যাদি সম্পর্কিত সিদ্ধান্তের মনোজ্ঞ বর্ণনা দিয়েছেন। এদিক থেকে বিচার করলে তাঁকে সিদ্ধান্ত–প্রণয়নের আদি তাত্ত্বিক বলে অভিহিত করা যায়। ষোড়শ শতাব্দীতে ম্যাকিয়াভেলী (Niccolo Machiavelli) তাঁর *The Prince* নামক গ্রন্থে রাজপুত্র ও অন্যান্য নীতি–নির্ধারকদের উপদেশ দিয়েছেন যে, রাষ্ট্রীয় স্বার্থ–সংরক্ষণের জন্য তাঁদের কি ধরনের সিদ্ধান্ত নেয়া উচিত।

ষাটের দশকে সরকারী কার্য পরিচালনার দায়িত্বে নিয়োজিত ব্যক্তিবর্গ, বিশেষতঃ প্রতিরক্ষা পরিকল্পনা প্রণয়ন যার মধ্যে নতুন ধরনের অস্ত্রশস্ত্র অর্জনের ব্যাপারটিও অন্তর্ভুক্ত, কোন কৌশলসমূহ মিতব্যায়িতার দিক থেকে আকর্ষণীয় তা' নির্ণয়ের জন্য

সিদ্ধান্ত প্রণয়ন পদ্ধতিটি কাজে লাগানো শুরু করেন। আন্তর্জাতিক সম্পর্কের ক্ষেত্রে এরপর তাত্ত্বিকগণ সংকট পরিস্থিতিতে সিদ্ধান্ত-প্রণয়নের ব্যাপরটির উপর অধিক মনোযোগ দিতে থাকেন।

যেহেতু অর্থনীতি ও ব্যবসায় প্রশাসনের পন্ডিতগণ সিদ্ধান্ত-প্রণয়নের কাঠামো উন্নয়নে প্রথমদিকে উল্লেখযোগ্য অবদান রাখেন, তাই এখানে বেনথামীয় উপযোগবাদের (Benthamite utilitarianism) অনেক পরিগ্রহ (assumption) বিদ্যমান যা সামাজিক বাছাইয়ের ক্ষেত্রে যুক্তি ও শিক্ষার উপর জোর দেয়। এটা ধরে নেয়া হয় যে, যিনি সিদ্ধান্ত নিবেন তিনি একজন বিজ্ঞ ব্যক্তি যিনি পরিষ্কারভাবে জানেন যে তাঁর সামনে কি কি বিকল্প বিদ্যমান এবং যিনি এগুলো কি ফলাফল বয়ে আনবে তা' হিসেব-নিকেশ করে অবাধভাবে মূল্যাবধারণের দিক দিয়ে কোনটি অধিক গুরুত্ব পেতে পারে তা' যথাযথভাবে নির্ণয়ে সক্ষম।

আন্তর্জাতিক সম্পর্কে সিদ্ধান্ত-প্রণয়নকে একটি পদ্ধতি হিসেবে বর্ণনা করা যায় যা পররাষ্ট্র নীতির সাথে সংশ্লিষ্ট ব্যক্তিবর্গ অনেকগুলো বিকল্প কার্যক্রম থেকে কোনটি পছন্দ করবেন সে সম্পর্কে আলোকপাত করে। অনেক পন্ডিত ব্যক্তিই মনে করেন যে, সর্বোৎকৃষ্ট সিদ্ধান্ত হল সেটি যা বিচারবুদ্ধি সম্পন্ন। কিন্তু বিচারবুদ্ধি সম্পন্ন বলতে কি বুঝায় এ নিয়ে অনেক তর্ক-বিতর্ক আছে। সহজভাবে বলতে গেলে বিচারবুদ্ধি সম্পন্ন বলতে বুঝায় অভীষ্ট লক্ষ্যের সাথে উপায়ের সংগতি রক্ষা করার সামর্থ্য। একই সাথে এটা নিশ্চিত করা যে, লক্ষ্য অর্জনের জন্য কার্যক্রম হাতে নিতে হয় এবং কিছু সংখ্যক লক্ষ্য অন্যগুলোর চেয়ে অধিকতর পছন্দনীয় বিবেচিত হতে বাধ্য।

সিদ্ধান্ত—প্রণয়নের ধারণাগত কাঠামো— বিভিন্ন মডেল

সিদ্ধান্ত-প্রণয়নের ধারণাগত কাঠামো সম্পর্কে আলোকপাত করতে গেলে প্রথমেই উল্লেখ করতে হয় রবিনসন (James Robinson) ও স্নাইডারের (Richard Snyder) বিখ্যাত উক্তিঃ "সিদ্ধান্ত-প্রণয়ন প্রক্রিয়া সম্পর্কে অনুসন্ধানের প্রধান উদ্দেশ্য হল সিদ্ধান্ত প্রক্রিয়া কেন ও কিভাবে সিদ্ধান্তের ফলাফলকে প্রভাবিত করে তা' নির্ধারণ করা।"[৩১] অন্য কথায় বলা যেতে পারে যে, বিভিন্ন বহিঃউদ্দীপক সিদ্ধান্ত-প্রণয়ন প্রক্রিয়া এবং সেই সাথে সিদ্ধান্তকে কিভাবে প্রভাবিত করে সে সম্পর্কে আলোচনা করাই সিদ্ধান্ত-প্রণয়ন পদ্ধতির আলোচ্য বিষয়। এটা বিভিন্ন সিদ্ধান্ত প্রণয়ন প্রক্রিয়ায় বিভিন্ন ফলাফল আসবে কিনা তা' নির্ধারণের ব্যাপারে চেষ্টা করে এবং সেই সাথে বিভিন্ন পরিস্থিতি, ব্যক্তিবর্গ ও সংগঠনের সমবায়ে বিভিন্ন নীতি উৎপাদিত হবে কিনা তাও নির্ধারণ করতে সচেষ্ট হয়।[২] এ বিষয় অবহিত হবার জন্য তাত্ত্বিকগণ অনেকগুলো সিদ্ধান্ত-প্রণয়ন মডেল উদ্ভাবন করেছেন।

এভাবে সিদ্ধান্ত–প্রণয়নের ধ্রুপদী মডেলে (classical model) যেহেতু এটা ধরে নেয়া হয় যে, নীতি–নির্ধারকগণ বিচারবুদ্ধিসম্পন্ন, তাই এ মডেল অনুযায়ী তাঁরা উপযোগিতা ও সম্ভাব্যতা এ দুটো মৌল মাত্রা হিসেব কষে স্বভাবতঃই ঐ ধরনের সিদ্ধান্ত নেবার চেষ্টা করবেন যা প্রত্যাশিত উপযোগিতাকে সর্বোচ্চ মাত্রায় বাড়ানোর প্রতিশ্রুতিদেয়।[৩] উদাহরণস্বরূপ বলা যেতে পারে যে, স্নাইডার মনে করেন যে এটা ধরে নেয়া যেতে পারে যে সিদ্ধান্ত–প্রণেতাগণ গুরুত্বের দিক দিয়ে যেটি স্পষ্ট পছন্দনীয় তার ভিত্তিতে কাজ করবেন, কিন্তু এখানে মনে রাখতে হবে যে এ ধরনের পছন্দ পুরোপুরিভাবে তাঁর ব্যক্তিগত ইচ্ছা নয় বরং তিনি যে প্রতিষ্ঠানের হয়ে কাজ করছেন তার নীতিমালা, দীর্ঘকালীন অভিজ্ঞতা, সিদ্ধান্ত–গ্রহণের সাথে যারা জড়িত তাঁদের নিকট যে তথ্য আছে তার উপর বহুলাংশে নির্ভর করে।[৪]

সিদ্ধান্ত–প্রণয়নকে যুক্তিসংক্রান্ত প্রণালী হিসেবে কল্পনা করা হলেও (যে অর্থে মানুষ তার অভীষ্ট লক্ষ্য ঠিক করে এবং তা' সর্বাধিকভাবে অর্জনের জন্য প্রয়োজনীয় উপায় অবলম্বন করে) হার্বার্ট সাইমন (Herbert Simon) স্মরণ করিয়ে দেন যে, মানুষ প্রায়শঃ সর্বাধিক মাত্রায় লক্ষ্য অর্জনে না গিয়ে (কারণ এ ধরনের সিদ্ধান্ত নেয়া অত্যন্ত দুঃসাধ্য) শুধুমাত্র "সন্তোষজনক" একটি অবস্থায় পৌঁছতে চায় অর্থাৎ ব্যহারযোগ্য বিকল্পগুলোকে ক্রমানুযায়ী অথবা ক্রমোন্নতি অনুযায়ী সাজিয়ে এমন অবস্থায় আসতে চায় যেখানে তাদের নির্দিষ্ট সংখ্যক প্রয়োজনীয়তা মিটে।[৫] চার্লস লিন্ডব্লমও (Charles Lindblom) অনুরূপভাবে "পূর্ণাঙ্গভাবে–যুক্তিসংক্রান্ত" মডেলের সম্ভাব্যতার বিষয় প্রশ্ন তুলে যুক্তি প্রদর্শন করেন যে, মানুষের পক্ষে শুধুমাত্র যে এরূপ পদ্ধতি নিবিড়ভাবে অনুসরণ করাই দুঃসাধ্য তাই নয়, অনেক সময় তাদেরকে এ মডেলের মূল পরিগ্রহগুলোকে লঙ্ঘন করতে হয়।[৬] এভাবে "সর্বোত্তম" নীতি যে অভীষ্ট লক্ষ্য সর্বাধিকভাবে অর্জনে সক্ষম সেটিই যে হতে হবে এমন কথা নেই, বরং যেটির ব্যাপারে সিদ্ধান্ত–প্রণেতাগণ মনে করেন যে, পরিশেষে তাঁরা একমত হতে পারবেন সেটিই সাধারণত হয়ে থাকে।

সাইমন মনে করেন যে, সিদ্ধান্ত–প্রণয়ন এককসমূহ বিকল্পগুলোকে অনুক্রমানুযায়ী পরীক্ষা করে দেখেন যতক্ষণ পর্যন্ত না তাঁরা নির্দিষ্ট মানদন্ড অনুযায়ী কোন একটিকে গ্রহণ করতে পারেন, অর্থাৎ তাঁরা অসন্তোষজনক সমাধানসমূহ বাতিল করেত থাকেন যতক্ষণ পর্যন্ত না তাঁরা পর্যাপ্তভাবে কোন সন্তোষজনক সমাধানে একমত হতে পারেন।[৭] এখানে উল্লেখ করা অপ্রাসঙ্গিক হবে না যে, তাঁর এ তত্ত্বের জন্য সাইমন ১৯৭৮ সনে অর্থনীতিতে নোবেল পুরস্কার লাভ করেন। সাইমন ও লিন্ডব্লমের বক্তব্য থেকে এটা স্পষ্ট প্রতীয়মান যে সিদ্ধান্ত–প্রণয়ন শুধুমাত্র একটি বুদ্ধিগত পদ্ধতি নয় যার মধ্যে অন্তর্ভুক্ত নীতি নির্ধারকদের অন্তঃর্দৃষ্টি, উপলব্ধি ও সৃষ্টিশীল স্বজ্ঞা, এটা সামাজিক ও আপাতঃদৃষ্টিতে প্রায় যান্ত্রিক পদ্ধতির একটি ব্যাপারও বটে।

আন্তর্জাতিক সম্পর্কে সিদ্ধান্ত–প্রণয়নের উপর প্রথম দিককার একজন বিশিষ্ট গবেষক স্নাইডার সিদ্ধান্ত–প্রণয়ন পদ্ধতিতে অভিপ্রায়গত বিশ্লেষণকে একটি বিরাট নির্ণায়ক হিসেবে গুরুত্বারোপ করেন।[৮] তিনি বলেন যে, তাত্ত্বিকদের উচিত সিদ্ধান্ত–প্রণেতাদের ব্যক্তিগত অতীতের মনোবৈজ্ঞানিক বিশ্লেষণের অনুসন্ধানে না গিয়ে বরং তাঁদের কার্যাবলীর সম্ভাব্য ভবিষ্যৎ পরিণতি সম্পর্কে জানার জন্য প্রধানত সচেষ্ট থাকা।[৯]

স্নাইডার, ব্রুক (H. W. Bruck) ও স্যাপিনের (Burton Sapin) পররাষ্ট্র নীতি সংক্রান্ত সিদ্ধান্ত–প্রণয়নের অধ্যয়নে তাঁরা ধরে নেন যে, আইনসম্মতভাবে যারা সিদ্ধান্ত–গ্রহণের সাথে জড়িত শুধু তাঁরাই বিবেচিত হবেন। সিদ্ধান্তসমূহের তুলনা ও ব্যাখ্যার জন্য তাঁরা তিনটি মাত্রার (dimension) উল্লেখ করেন। প্রতিটি মাত্রায় থাকবে একগুচ্ছ করে চলক যেগুলো সিদ্ধান্ত–প্রণয়ন সংক্রান্ত আচরণকে নির্ধারণ করবে। এর প্রথমটিকে বলা হয় 'যোগ্যতার পরিধি' (sphere of competence) যা সিদ্ধান্ত–প্রণয়ন প্রতিষ্ঠান অথবা এককের বৈশিষ্ট্য নিয়ে আলোচনা করে। এখানে দেখা হয় এটার গঠন মজবুত অথবা শিথিল কিনা, এর পরিবর্তনের ক্ষমতা আছে কিনা এবং এতে কোন পর্যায়ের আমলাগণ উপস্থিত, ইত্যাদি। দ্বিতীয়টি 'যোগাযোগ ও তথ্য' (communication and information) গুচ্ছ নামে অভিহিত যা কোন প্রতিষ্ঠানের মধ্যে কে কার সাথে, কিভাবে যোগাযোগ রক্ষা করে; বাইরে থেকে ঐ প্রতিষ্ঠানে কি তথ্য আসে এবং প্রতিষ্ঠানটি সে তত্ত্ব গ্রহণের ব্যাপারে কতটুকু নমনীয় তা' নিয়ে আলোচনা করে। তৃতীয়ত, 'অভিপ্রায়মূলক' (motivational) চলকগুচ্ছ পুরো সিদ্ধান্ত–প্রণয়ন এককটির উদ্দেশ্যাবলী, এর সাথে জড়িত সবার আদর্শ ও নৈতিক মান ইত্যাদির সাথেসম্পর্কযুক্ত।[১০]

১৯৬২ সনে কিউবার ক্ষেপণাস্ত্র সংকটের সময় মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের সিদ্ধান্তসমূহ বুঝার সুবিধার জন্য আন্তর্জাতিক সম্পর্কের আরেকজন বিশিষ্ট পন্ডিত গ্রাহাম এলিসন (Graham T. Allison) তিনটি "ধারণাগত মডেল" উদ্ভাবন করেছেন যা সঠিকভাবে পররাষ্ট্র নীতির কার্যাবলী ও সিদ্ধান্তসমূহ ব্যাখ্যার জন্য বিশেষ উপযোগী। তিনি তাঁর প্রথম মডেলটিকে 'যৌক্তিক কর্মক' মডেল (Rational Actor model) হিসেবে অভিহিত করেছেন। তাঁর মতে, অধিকাংশ পররাষ্ট্র নীতি বিশ্লেষক মনে করেন, এবং সরকারী আচরণকে যৌক্তিক কর্মক অথবা ধ্রুপদী মডেলের আলোকে ব্যাখ্যা করেন, যেখানে নীতি বাছাইকে অভিন্ন সরকারী কার্যাবলী হিসেবে দেখা হয় যা কমবেশী অভিপ্রায়মূলক অর্থাৎ বিশেষ উদ্দেশ্যাবলী অর্জনের যৌক্তিক উপায় হিসেবে গ্রহণ করা হয়।[১১] আরও পরিষ্কাররূপে বলতে গেলে বলা যায় যে ধ্রুপদী অর্থনীতিবিদদের মত যৌক্তিক কর্মক মডেলেও ধরে নেয়া হয় যে কোন ব্যক্তি যত সীমাবদ্ধতার ভিতরেই বাছাই করতে বাধ্য হোন না কেন তিনি তাঁর সামনে যে বিকল্পগুলো পাবেন সেগুলোকে সুবিধার ক্রমানুযায়ী সাজাতে এবং এগুলোর মধ্য থেকে সর্বোত্তমটিকে গ্রহণ করতে সক্ষম হবেন। এভাবে

বিজ্ঞ ব্যক্তিগণ কোন সিদ্ধান্ত গ্রহণের পূর্বে তাঁদের উদ্দেশ্যাবলীকে পরিষ্কাররূপে নির্ধারণ করতে ও তাঁদের সামনে যে বিকল্পগুলো আছে এগুলোর প্রত্যেকটির সম্ভাব্য ফলাফল সম্পর্কে সঠিক ধারণা করতে পারেন।[১২]

যৌক্তিক কর্মক মডেলে সরকারকে একক সিদ্ধান্ত-প্রণয়নকারী প্রতিষ্ঠান হিসেবে বিবেচনা করা হয় অর্থাৎ এখানে সিদ্ধান্ত-প্রণেতাদের মতদ্বৈততাকে অস্বীকার করা হয়। কিন্তু যেহেতু সরকার বিভিন্ন ব্যক্তিবর্গ ও প্রতিষ্ঠানের সমন্বয়ে গঠিত তাই তাদের নিজস্ব মূল্যবোধ, অভীষ্ট লক্ষ্য ও মতামতও এতে প্রতিফলিত হয়, তাই সিদ্ধান্ত-প্রণেতাগণ কদাচিৎ এক সুরে কথা বলেন। এ সত্য মনে রেখেই এলিসন তাঁর দ্বিতীয় ও তৃতীয় মডেল উপস্থাপন করেছেন।

এলিসনের দ্বিতীয় মডেল 'প্রাতিষ্ঠানিক পদ্ধতি' মডেল (Organizational Process model) নামে অভিহিত। এতে বলা হয় যে, সরকার গঠনকারী বিভিন্ন প্রতিষ্ঠানসমূহ সিদ্ধান্ত-প্রণয়নের জন্য ঐ ধরনের তথ্যাদি সরবরাহ করবে যা তাদের জন্য হিতকারী এবং অনেক সময় প্রাসঙ্গিক তথ্যসমূহ চেপে যেতে পারে।[১৩] উদাহরণস্বরূপ বলা যায় যে, ১৯৬১ সনের পিগস উপসাগরে (Bay of Pigs) ব্যর্থ পরিণতির সময় মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের কেন্দ্রীয় গোয়েন্দা সংস্থা (CIA) কিউবার ফিদেল ক্যাস্ট্রোকে ক্ষমতাচ্যুৎ করার সম্ভাব্য সাফল্য সম্পর্কে প্রেসিডেন্ট কেনেডীর নিকট ত্রুটিপূর্ণ তথ্য সরবরাহ করে।

প্রত্যেক প্রতিষ্ঠানের নিজস্ব আইন বই, পথপঞ্জি ইত্যাদি থাকে যা নির্দেশিত করে যে ঐ প্রতিষ্ঠানের বিভিন্ন কার্যাবলী কিভাবে সম্পন্ন করা হবে। এলিসন তাঁর দ্বিতীয় মডেলটি সম্পর্কে আলোচনা করতে গিয়ে যথার্থই বলেছেন যে, পরের দিন কি ঘটবে তার সর্বোৎকৃষ্ট ব্যাখ্যা পাওয়া যায় আজ কি ঘটেছে তার মাধ্যমে।[১৪] এটা বস্তুতঃপক্ষে সতর্ক, ক্রমবর্ধমান মডেলের অত্যন্ত সংক্ষিপ্ত বিবরণ। এভাবে প্রাতিষ্ঠানিক পদ্ধতি মডেলটিকে তিনটি মূল বক্তব্যের দ্বারা প্রকাশ করা যায়ঃ (১) সরকার গঠিত হয় কিছুসংখ্যক শিথিলভাবে একত্রীভূত প্রতিষ্ঠান দ্বারা; (২) সরকারী সিদ্ধান্ত ও আচরণকে বিচারবুদ্ধিসম্পন্ন বাছাই নয়, বরং প্রচলিত নমুনামূলক আচরণ অনুযায়ী বৃহৎ প্রতিষ্টানগুলো যেভাবে কার্য নির্বাহ করে সেভাবে বুঝতে হবে; এবং (৩) প্রত্যেক প্রতিষ্ঠান তার প্রচলিত ক্রিয়াকলাপ প্রণালী (standard operating procedures), রুটিন অথবা কর্মসূচী সহযোগে গতকাল যেভাবে আচরণ করেছে আজ অনেকটা সেভাবে এবং আগামীকালও আজকের মত আচরণ করবে।[১৫]

এলিসনের তৃতীয় মডেলটি, যা 'সরকারী দর কষাকষি' মডেল (Governmental Bargaining model) নামে পরিচিত, যৌক্তিক কর্মক মডেল থেকে অনেকটা ভিন্নধর্মী সিদ্ধান্ত-প্রণয়নের চিত্র তুলে ধরে। এ মডেলে বলা হয় যে, যেসকল ঘটনা ঘটে তা' বুদ্ধিগত বাছাই নয়, বরং সরকারী কাজে জড়িত ব্যক্তিবর্গের বিভিন্ন "দর কষাকষি ক্রীড়া"-র ফল।[১৬] সরকারী রাজনীতি মডেলটি প্রাতিষ্ঠানিক

পদ্ধতি মডেল থেকেও অনেকটা ভিন্ন এ কারণে যে প্রাতিষ্ঠানিক সীমাবদ্ধতা ও স্বার্থকে ছাপিয়ে এখানে যে কোন ব্যক্তি তাঁর নিজস্ব ব্যক্তিত্ব ও সামর্থ্যের মাধ্যমে তাঁর পছন্দসই সিদ্ধান্ত গ্রহণে প্রভাব খাটাতে পারেন। এভাবে এলিসনের তৃতীয় মডেলটি ব্যক্তির "ক্ষমতা ও দক্ষতা"র প্রতি বিশেষ জোর দেয়। ব্যক্তির ক্ষমতা প্রধানতঃ সরকারে তাঁর অবস্থানের উপর নির্ভর করলেও এমন অনেকে আছেন যারা নিজেদের ব্যক্তিত্ব ও দক্ষতার মাধ্যমে এ ক্ষমতাকে বাড়াতে অথবা কমাতে পারেন। উদাহরণস্বরূপ বলা যেতে পারে যে প্রেসিডেন্ট নিক্সনের সময় অনেকদিন যাবৎ উইলিয়াম রজার্স পররাষ্ট্র সচিব থাকা সত্ত্বেও জাতীয় নিরাপত্তা বিষয়ক উপদেষ্টা হেনরী কিসিঞ্জার পররাষ্ট্র নীতি ও জাতীয় নিরাপত্তা বিষয়ে অবিসংবাদিতভাবে প্রেসিডেন্টের প্রধান উপদেষ্টা ছিলেন। অনুরূপভাবে প্রেসিডেন্ট কেনেডীর সময় প্রতিরক্ষা সচিব রবার্ট ম্যাকনামারা পররাষ্ট্র সচিব ডীন রাস্কের চেয়ে পররাষ্ট্র বিষয়ে অধিক কেন্দ্রীয় ভূমিকা পালন করেছেন।

কিছুসংখ্যক পন্ডিত প্রাতিষ্ঠানিক পদ্ধতি মডেলের সাথে সরকারী রাজনীতি মডেলকে একত্রিত করে 'আমলাতান্ত্রিক রাজনীতি' মডেল (Bureaucratic Politics model) খুঁজে বের করেছেন যা' প্রতিষ্ঠান ও রাজনীতি উভয়ের কিছু কিছু উপাদান বজায় রাখে। আমলাতান্ত্রিক রাজনীতি মডেলকে পররাষ্ট্র নীতি পদ্ধতি সম্পর্কে তিনটি প্রশ্নের মাধ্যমে সংক্ষেপে বর্ণনা করা যায়ঃ কে অংশগ্রহণ করেন? অংশগ্রহণকারী প্রত্যেক খেলোয়াড়ের অবস্থান কে নির্ণয় করেন? এই ভিন্ন অবস্থানগুলো কিভাবে একত্রিত হয়ে সরকারী সিদ্ধান্ত ও কার্যে পরিণত হয়? প্রথম প্রশ্নটির উত্তরের ক্ষেত্রে ভূমিকা খুবই গুরুত্বপূর্ণ। দ্বিতীয়টির উত্তরের ক্ষেত্রে ভূমিকা এবং ব্যক্তির বৈশিষ্ট্যপূর্ণ উপাদানসমূহ গুরুত্বপূর্ণ। সরকারী উপাদানসমূহ যেমন যোগাযোগের লাইন ও গঠন প্রণালী, প্রাতিষ্ঠানিক ক্রমোচ্চ শ্রেণীবিভাগ (hierarchy) ইত্যাদি ছাড়াও উপরের দুটো বিষয় তৃতীয় প্রশ্নটির উত্তরের ক্ষেত্রে গুরুত্বপূর্ণ।[১৭]

আমলাতান্ত্রিক রাজনীতি মডেলে কোন বিশেষ অবস্থায় সরকার কি করে তা' অনেকাংশে অংশগ্রহণকারী খেলোয়াড়দের মধ্যকার দর কষাকষির ফল হিসেবে দেখা উচিত। এ খেলোয়াড়গণ সরকারের অভ্যন্তরে ক্রমোচ্চ শ্রেণীবিভাগের ভিত্তিতে অবস্থান করেন (ভূমিকা সম্বলিত উপাদনসমূহ)। তাঁদের মধ্যে যে দর কষাকষি হয় তা' নিয়মমাফিক প্রদক্ষিণ পথ অনুসরণ করে (ভূমিকা ও সরকারী উপাদানসমূহ)। পরিশেষে, এ দর কষাকষি এবং ফলাফল, সিদ্ধান্ত ক্রীড়া এবং কার্যাবলী ক্রীড়াসমূহ অনেকগুলো সীমাবদ্ধতা দ্বারা প্রভাবিত হয়, বিশেষত প্রাতিষ্ঠানিক পদ্ধতি (ভূমিকা) এবং খেলোয়াড়দের ব্যক্তিগত রাজনৈতিক দক্ষতার (ব্যক্তির বৈশিষ্ট্য) দ্বারা।[১৮]

আমলাতান্ত্রিক রাজনীতি মডেল অনুযায়ী সিদ্ধান্ত–প্রণয়নে কোন একক প্রতিষ্ঠান জড়িত থাকে না যারা একসুরে কথা বলেন, বরং এখানে অনেকগুলো একক থাকতে পারে যেগুলোর মধ্যে প্রবল প্রতিদ্বন্দ্বিতা বিদ্যমান। এভাবে পররাষ্ট্র নীতি সম্পর্কিত সিদ্ধান্ত আমলাতন্ত্রের বিভিন্ন শাখার প্রতিনিধিদের মধ্যে দর কষাকষির ফল। এ সকল আমলাগণ

কোন দৃঢ় রণকৌশলমূলক সুচিন্তিত পরিকল্পনা নয়, বরং তাঁদের আমলাতান্ত্রিক স্বার্থ ও ব্যক্তিগত সুবিধাদির চিন্তা দ্বারা অধিক পরিচালিত হন। এ মডেলে বলা হয় যে, সিদ্ধান্ত–প্রণেতাদের মধ্যে বৃহত্তর জাতীয় স্বার্থের ধারণাকে তাঁদের নিজস্ব আমলাতান্ত্রিক এককের জন্য এটা মঙ্গলকর কিনা এ ধরনের উপলব্ধি দ্বারা পরিশ্রুত হবার প্রবণতা দেখা যায়।[১৯] মরটন হালপেরিন (Morton Halperin) অনেকগুলো পররাষ্ট্র নীতি সংক্রান্ত সিদ্ধান্ত পরীক্ষা করে দেখিয়েছেন কিভাবে সরকারের অভ্যন্তরস্থ রাজনীতি এ সিদ্ধান্তসমূহকে প্রভাবিত করেছে।[২০] আমলাতন্ত্রের আরেকটি বৈশিষ্ট্য সম্পর্কে ফ্রান্সিস রুর্ক (Frances E. Rourke) নিউটনের গতি বিষয়ক প্রথম সূত্রের প্রতিধ্বনি করে বলেছেন যে, "স্থির আমলাতন্ত্র স্থির থাকতে চায় এবং গতিশীল আমলাতন্ত্র গতিশীল থাকতে চায়।"[২১] যা হোক, জর্জের (Alexander L. George) মতে, আমলাতন্ত্রের অভ্যন্তরস্থ বিরোধ ও দর কষাকষি অধিকতর শ্রেয় সিদ্ধান্ত–প্রণয়ন প্রক্রিয়ায় অবদান রাখতে পারে যদি তাকে যথাযথভাবে নিয়ন্ত্রণ ও সমাধান করা যায়।[২২] এর কারণ হিসেবে ইরভিং জেনিসের (Irving Janis) বক্তব্যের উল্লেখ করা যায়। তিনি বলেন যে সিদ্ধান্ত–প্রণেতাগণ যখন গ্রুপ হিসেবে কাজ করেন তখন যে সকল গ্রুপ নীতির ব্যাপারে ভিন্নমতকে হয় সূক্ষ্মভাবে নয় প্রত্যক্ষভাবে নিরুৎসাহিত করে দ্রুত মতৈক্যে পৌঁছে তখন তা' নিম্নমানের সিদ্ধান্তে পর্যবসিত হয়।[২৩]

সাম্প্রতিক বছরগুলোতে সুবিধা–অসুবিধাসমূহের বিজ্ঞ যাচাইয়ের ভিত্তির উপর গড়ে ওঠা সিদ্ধান্ত–প্রণয়নের ধ্রুপদী উপযোগবাদ কাঠামো ক্রমবর্ধমান সমালোচনার সম্মুখীন হয়েছে। যেহেতু এটা সকল প্রকার সিদ্ধান্তকে ব্যাখ্যা করতে পারে না তাই এর বিকল্প হিসেবে জন স্টেইনব্রুনার (John D. Steinbruner) "সাইবারনেটিক প্যারাডাইম" (cybernetic paradigm) নামে সিদ্ধান্ত–প্রণয়নের একটি নতুন মডেলের প্রস্তাব করেছেন।[২৪] উদাহরণস্বরূপ তিনি টেনিস খেলোয়াড়দের সাইবারনেটিক সিদ্ধান্ত–প্রণেতা হিসেবে অভিহিত করেছেন। তাঁর মতে, টেনিস খেলোয়াড়গণ প্রত্যেকবারই যখন কোন বল মোকাবিলা করেন তখন তারা আগত বলের গতি ও দিকের গাণিতিক হিসেব না কষে (এত অল্প সময়ের মধ্যে এটা সম্ভব নয়) শত–সহস্র শটের মধ্যে তাদের সুবিধাজনক একটি শটকে বেছে নেন। ঐ স্বল্প সময়ে তাদের একমাত্র চিন্তা থাকে বলকে বিপক্ষের কোর্টে ফেরৎ পাঠানো। এভাবে সাইবারনেটিক সিদ্ধান্ত–প্রণয়নের মডেল উপস্থাপনকারী পন্ডিতদের মতে সিদ্ধান্ত–প্রণয়ন মোটামুটি সহজ কাজ এবং এজন্য তাঁদের প্রচেষ্টা থাকে কিভাবে গাণিতিক অথবা উপযোগের জটিল হিসেবকে যতদূর সম্ভব এড়ানো যায়।

কিন্তু তবুও একথা অস্বীকার করার উপায় নেই যে, প্রাতিষ্ঠানিক ভূমিকা ও ব্যক্তির মনস্তাত্ত্বিক উপাদানসমূহ উভয়ই সিদ্ধান্ত–প্রণয়নকে যথেষ্ট প্রভাবিত করে। সিদ্ধান্ত–প্রণেতাদের ধ্যান–ধারণা ও বাস্তব জগতের মধ্যে পার্থক্য থাকতে পারে। তবে এ পার্থক্য যত কম হবে সিদ্ধান্ত–প্রণয়ন পদ্ধতি তত উৎকৃষ্ট বলে বিবেচিত হবে। সাধারণত

বিষয় বিশ্লেষণের মাধ্যমে সিদ্ধান্ত–প্রণেতাদের ধ্যান–ধারণা সম্পর্কে অবহিত হওয়া যায়। তাই বিষয় বিশ্লেষণ সিদ্ধান্ত–প্রণয়ন তত্ত্ব উন্নয়নে বিশেষ ভূমিকা রাখতে পারে।

সংকটকালীন সিদ্ধান্ত

সাধারণত সংকটকালীন সিদ্ধান্ত, পররাষ্ট্র নীতি বিষয়ক সিদ্ধান্ত ও প্রশাসনিক সিদ্ধান্তের মধ্যে পার্থক্য করা হয়। সংকটকালীন সিদ্ধান্তে সচরাচর খুব কম সংখ্যক উচ্চ পর্যায়ের সিদ্ধান্ত প্রণেতা জড়িত থাকেন। সংকট একটা বিশেষ অবস্থাকে নির্দেশিত করে যার মধ্যে কিছু সংখ্যক বৈশিষ্ট্য বিদ্যমান থাকে, যথা সীমাবদ্ধ অথবা বিশেষভাবে নির্দিষ্ট সিদ্ধান্ত সময়। সাধারণ প্রথানুসারে এ সময় খুবই সংক্ষিপ্ত। এ ধরনের অবস্থার মধ্যে সিদ্ধান্ত–প্রণেতাগণ এবং তাঁদের রাষ্ট্রের প্রতি বিরাট রকমের ভীতি অন্তর্ভুক্ত থাকে, অথবা সিদ্ধান্ত–প্রণেতাগণ তাঁদের মৌল মূল্যবোধের প্রতি ভীতি উপলব্ধি করেন। কোন কোন পন্ডিত সংকটের মধ্যে আকস্মিকতার চমককে অন্তর্ভুক্ত করেন। এভাবে সংকট পরিস্থিতিকে ভীতি, সংক্ষিপ্ত অথবা সীমাবদ্ধ সিদ্ধান্ত সময়, এবং বিস্ময় দ্বারা বর্ণনা করা যায়।[২৫]

সংকটকালীন সময় সিদ্ধান্ত–প্রণেতাগণ পীড়ণের (stress) মধ্যে থাকেন এবং অত্যধিক তথ্যাদি পান যা তাঁদেরকে হয় অধিক অথবা অল্প প্রতিক্রিয়া ব্যক্ত করার দিকে পরিচালিত করে।[২৬] সংকট যত বাড়তে থাকে সিদ্ধান্ত–প্রণেতাগণ অধিকভাবে মনে করতে থাকেন যে, তাঁদের নিজস্ব বিকল্পসমূহের সীমা তত বেশী গন্ডীবদ্ধ হয়ে যাচ্ছে। সুতরাং সংকট গ্রহণযোগ্য বিকল্পসমূহ সম্পর্কে তাঁদের উপলব্ধিগুলোকে খর্ব করে। একই সাথে সিদ্ধান্ত–প্রণেতাগণ মনে করতে থাকেন যে, তাঁদের বিপক্ষের বিকল্পসমূহ অধিকভাবে বেড়ে যাচ্ছে।[২৭]

১৯১৪ সনে প্রথম বিশ্বযুদ্ধ আরম্ভ হবার অব্যবহিত পূর্বে ইউরোপের বৃহৎ শক্তিবর্গ যে ধরনের সংকটে পতিত হয় এবং ১৯৬২ সনে সোভিয়েত ইউনিয়ন কর্তৃক মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের শত্রু ভাবাপন্ন নিকট প্রতিবেশী কিউবায় ক্ষেপণাস্ত্র মোতায়েনের বিষয় নিয়ে দুই পরাশক্তির মধ্যে যে সংকটের সৃষ্টি হয় এ উভয় পরিস্থিতিতে সংশ্লিষ্ট রাষ্ট্রসমূহের মধ্যে যে সকল তথ্যের আদান–প্রদান হয়েছে অধ্যাপক হলষ্টি (Ole R. Holsti), নর্থ (Robert C. North), ব্রডি (Richard A. Brody) ও অন্যান্য পন্ডিতগণ সংকটকালীন সিদ্ধান্ত–প্রণয়নকে ব্যাখ্যা করার উদ্দেশ্যে তা' পরিমাপের প্রচেষ্টা নেন।[২৮] তাঁরা যে মডেল উদ্ভাবন করেন তা' প্ররোচণা–প্রতিক্রিয়া মডেল (Stimulus-Response model) নামে সুপরিচিত। বিষয় বিশ্লেষণের মাধ্যমে উপাত্ত সংগ্রহ করে তাঁর সাহায্যে এ মডেলকে পরীক্ষা করে সিদ্ধান্ত প্রণয়ন, বিশেষতঃ সংকটকালীন সময় সিদ্ধান্ত–প্রণয়ন, সম্পর্কিত গবেষণায় তাঁরা একটি নতুন মাত্রা যোগ করেন। এ নতুন ধরনের গবেষণা পদ্ধতিটি সিদ্ধান্ত প্রণয়ন এককগুলোর ভিতরের চেয়ে তাদের পারস্পরিক আন্তঃক্রিয়ার উপরই অধিক আলোকপাত করে থাকে। এখন বিষয় বিশ্লেষণ কি, এজন্য

কি পদ্ধতি অবলম্বন করা হয়ে থাকে এবং আন্তর্জাতিক সম্পর্কের গবেষণায় কিভাবে এটাকে কাজে লাগানো হয় সে সম্পর্কে আলোচনা করা হবে।

বিষয় বিশ্লেষণ কি?

সামাজিক বিজ্ঞানের উর্বর ঐতিহ্যের সাথে সংগতি রেখে যেখানে প্রায়শ মানুষের বহুমুখী আচরণ সম্পর্কিত বিভিন্ন সমস্যা ও ঐগুলোর সমাধানের উপায় খুঁজে বের করার উদ্দেশ্যে সুসংবদ্ধ গবেষণা পরিচালনা করা হয়, যেমন অর্থনীতিবিদগণ জানতে চান যে, কোন দেশের অর্থনীতিতে বেসরকারী বিদেশী বিনিয়োগের ফলাফল কি; সমাজ বিজ্ঞানীগণ জানতে চান যে, উঠতি বয়সের যুবক-যুবতীদের নেশায় আসক্তি সমাজে কিরূপ প্রভাব ফেলতে পারে; মনোবিজ্ঞানীগণ জানতে চান যে, বর্তমান বিশ্বে অধিক সংখ্যক হতাশাগ্রস্ত যুবক-যুবতীদের মানসিক স্বাস্থ্যের উন্নতির জন্য কি করা দরকার; রাষ্ট্রবিজ্ঞানীগণ জানতে চান যে, কোন নির্বাচনের সময় কোন একটি বিশেষ রাজনৈতিক ইস্যুতে ভোটারগণ কি ধরনের আচরণ করবে, ইত্যাদি; অনুরূপভাবে আন্তর্জাতিক সম্পর্কের ক্ষেত্রেও বিভিন্ন পন্ডিত ও গবেষক সর্বদাই গবেষণা কার্যে নিয়োজিত যার অধিকাংশের উদ্দেশ্য হল সিদ্ধান্ত-প্রণেতাদের কোন বিশেষ সিদ্ধান্ত আন্তর্জাতিক ক্ষেত্রে কিরূপ প্রভাব ফেলতে পারে, অথবা কোন বিশেষ পরিস্থিতিতে কি ধরনের সিদ্ধান্ত নেয়া উচিত সে সম্পর্কে তাঁদেরকে তাত্ত্বিক জ্ঞান সরবরাহের মাধ্যমে সহায়তা করা। এ ধরনের গবেষণাকে সুসম্বদ্ধ করতে বিষয় বিশ্লেষণ বিরাট সুযোগ সৃষ্টি করতে পারে।

বর্তমানে আন্তর্জাতিক সম্পর্কের গবেষণার মূল প্রচেষ্টা হল বৈজ্ঞানিক তত্ত্বের উদ্ভাবন ও উন্নয়ন যা নীতি-নির্ধারকদেরকে তাঁদের প্রণীত নীতি আন্তর্জাতিক ক্ষেত্রে কি ধরনের প্রভাব ফেলতে পারে সে সম্পর্কে অন্তঃদৃষ্টির যোগান দিয়ে তাঁদেরকে অবশ্য করণীয় সম্পর্কে অবহিত করতে পারে। এ ধরনের তত্ত্ব উন্নয়নের একটি প্রয়োজনীয় ধাপ হল বিভিন্ন প্রকার প্রকল্প (hypothesis) প্রস্তাব করে তা' উপাত্তের সাহায্যে পরীক্ষা করে দেখা, এবং গবেষকগণ এখন বিষয় বিশ্লেষণকে এরূপ উপাত্ত সংগ্রহের একটি কৌশল হিসেবে বহুল ব্যবহার করছেন।

সাধারণভাবে কোন পন্ডিত তাঁর গবেষণা প্রকল্প পরিচালনার সময় অনেক তথ্য সংগ্রহ করেন যেগুলো থেকে বিশেষ পদ্ধতি অবলম্বন করে সেগুলোকে উপাত্তে পরিণত করা হয় যা তাঁর প্রকল্প পরীক্ষার কাজে লাগানো হয়। আন্তর্জাতিক সম্পর্কে, বিশেষত সিদ্ধান্ত-প্রণয়ন কাঠামো উদ্ভাবন ও উন্নয়নে, প্রধান সিদ্ধান্ত-গ্রহণকারীর সঠিক মনোভাব তাঁর বিভিন্ন বক্তব্য ও অন্যান্য দেশের সাথে যে সকল গুরুত্বপূর্ণ দলিল বিনিময় করা হয় তা' থেকে বিষয় বিশ্লেষণ প্রণালীর মাধ্যমে উদ্ধার করা হয়। তাঁদের এ ধরনের বক্তব্য সম্বলিত পুস্তকাদি ও সরকারী দলিল-দস্তাবেজ দীর্ঘাকৃতি হয়ে থাকে। এগুলো থেকে তাঁদের মূল মনোভাব আহরণ করতে যে কৌশল অবলম্বন করা হয় তার নাম বিষয় বিশ্লেষণ। আলেক্সান্ডার জর্জের (Alexander George) মতে, "কোন বক্তার

উদ্দেশ্যমূলক আচরণের কিছু দিক সম্পর্কে বিশেষ সিদ্ধান্তে উপনীত হতে বিষয় বিশ্লেষণকে একটি বৈশিষ্ট্যমূলক যন্ত্র হিসেবে ব্যবহার করা হয়।"[২৯]

বিষয় বিশ্লেষণকে "দীর্ঘায়িত মৌখিক প্রতিবেদনকে সার-সংক্ষেপে কমিয়ে আনতে এবং এরপর একই ধরনের প্রতিবেদনকে শ্রেণীতে বিভক্ত করতে যেগুলোকে সংখ্যায় প্রকাশ করা যায় এরূপ পদ্ধতি হিসেবে"[৩০] সংজ্ঞায়িত করা হয়। বার্নার্ড বেরেলসন (Bernard Berlson), যিনি বিষয় বিশ্লেষণের উপর প্রথমবারের মত ঐকান্তিক দৃষ্টি দেন এবং এটাকে জনপ্রিয় করে তুলেন, বিষয় বিশ্লেষণকে "যোগাযোগের প্রকাশ্য বিষয়কে বস্তুগত, সুসম্বদ্ধ ও পরিমাণগতভাবে বর্ণনা করার জন্য" একটি গবেষণা কৌশল হিসেবে সংজ্ঞায়িত করেছেন।[৩১] আন্তর্জাতিক সম্পর্কের বিশিষ্ট পন্ডিত অধ্যাপক হলস্তি বিষয় বিশ্লেষণকে একটি পদ্ধতি হিসেবে বর্ণনা করেছেন যার মাধ্যমে "অবিশ্লেষিত উপাত্তকে নিয়মবদ্ধভাবে এককে রূপান্তরিত ও একত্রিত করা হয় যার ফলে প্রাসঙ্গিক বিষয়ের বৈশিষ্ট্যসমূহকে যথাযথভাবে বর্ণনা করতে সুবিধা হয়।"[৩২] এভাবে বলা যায় যে, বিষয় বিশ্লেষণ হল একটি কৌশল যা দ্বারা যে কোন প্রকার যোগাযোগের বিষয়বস্তুর বিশ্লেষণ করা ও এতদ্‌সম্পর্কে সিদ্ধান্তে পৌছা যায়।

বিষয় বিশ্লেষণে অনুসৃত পদ্ধতি

বিষয় বিশ্লেষণের জন্য যে পদ্ধতি অবলম্বন করা হয় সে সম্পর্কে আলোচনা করতে গেলে বলতে হয় যে, দুটো দিকের প্রতি লক্ষ্য রাখতে হবেঃ যে বিষয় বৈশিষ্ট্যগুলোকে পরিমাপ করতে হবে তা' স্বতন্ত্র করা, এবং উপাত্তের বৈশিষ্ট্যগুলোর সনাক্তকরণ ও তালিকাভুক্তির জন্য মাপদন্ড প্রয়োগ করা।

প্রথমেই ঠিক করে নিতে হয় সরকারী নথিপত্র অথবা পরস্পরের মধ্যে বিনিময়কৃত দলিল-দস্তাবেজের মধ্য থেকে কি ধরণের বৈশিষ্ট্যমূলক বিষয় আহরণ করতে হবে। এটা অনেকটা নির্ভর করে গবেষক সিদ্ধান্ত-প্রণেতাদের কোন বিশেষ দিকটি সম্পর্কে জানতে চান তার উপর। এরপর তাঁকে পরিমাপের প্রতি দৃষ্টি নিবদ্ধ করতে হয়। এজন্য তিনি পরিমাপের দুটো মূল এককের একটিকে তাঁর প্রয়োজনানুযায়ী বেছে নিতে পারেন। এ দুটো হলঃ সংকেত একক (coding unit) ও বর্ণনা একক (context unit)। সংকেত একক সাধারণত আহরণ করা হয় কোন একটি নির্দিষ্ট বিষয় কোন একটি নথিতে একই অথবা সমার্থক শব্দ অথবা ভাব দ্বারা কতবার উল্লেখ করা হয়েছে সেগুলো গণনার মাধ্যমে। এবং বর্ণনা একক অনুরূপভাবে আহরণ করা হয় বক্তা কতবার কোন একটি নির্দিষ্ট বিষয়কে কতবার বর্ণনা করেছেন তার গণনার মাধ্যমে। এ ধরনের গণনার কাজ শেষ হলে তিনি যথোপযুক্ত পরিসংখ্যান পরীক্ষার মাধ্যমে দেখার চেষ্টা করেন যে, তাঁর নাস্তি-প্রকল্প বর্জন করতে হবে কিনা অথবা তা' সাময়িকভাবে গ্রহণযোগ্য কিনা।

বিষয় বিশ্লেষণের উদাহরণ হিসেবে অধ্যাপক হলষ্টির "চীন ও সোভিয়েত ইউনিয়নের ক্ষেত্রে বাইরের দ্বন্দ্ব ও অভ্যন্তরীণ ঐকমত্য" শীর্ষক গবেষণা কর্মটির উল্লেখ করা যায়।[৩৩] এখানে হলষ্টি যে প্রকল্পটি পরীক্ষা করেন তা' হলঃ "ব্লক অভ্যন্তরস্থ সম্পর্ক দুই ব্লকের পারস্পরিক দ্বন্দ্বের মাত্রা অনুযায়ী পরিবর্তিত হয়," অথবা প্রকল্পের প্রচলিত উক্তি অনুযায়ী,

> পূর্ব ও পশ্চিমের মধ্যকার তীব্র উত্তেজনা চলাকালীন সময় চীন ও সোভিয়েত ইউনিয়নের মধ্যকার সম্পর্কে অধিক ঐকমত্য পরিলক্ষিত হবে, কিন্তু পক্ষান্তরে উত্তেজনা কমে গেলে ঐকমত্য মাত্রাও নেমে যাবে।

যেহেতু হলষ্টির গবেষণার উদ্দেশ্য ছিল মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের প্রতি চীন ও সোভিয়েত ইউনিয়নের মনোভাব সম্পর্কে সিদ্ধান্তে পৌঁছা, তাই তিনি তাঁর প্রকল্পকে নিম্নরূপ কার্যকরভাবে ব্যক্ত করেনঃ

> দুই ব্লকের মধ্যে যখন পারস্পরিক দ্বন্দ্বের পরিমাণ বেশী থাকে তখন মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের প্রতি চীন ও সোভিয়েত ইউনিয়নের একই ধরনের মনোভাব ব্যক্ত করার ঝোঁক থাকবে, কিন্তু পক্ষান্তরে উত্তেজনা কম থাকাকালে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের নীতির প্রতি তাদের মনোভাব ভিন্নমুখী হবে।

অধ্যাপক হলষ্টি তাঁর গবেষণায় উপাত্ত সংগ্রহের জন্য ব্যবহার করেন ৩৮টি সোভিয়েত ও ৪৪টি চীনা নথি যাতে সর্বমোট প্রায় ১৫০,০০০ শব্দ অন্তর্ভুক্ত ছিল। ঐগুলো ১৯৫০ থেকে ১৯৬৫ সন পর্যন্ত সাতটি নির্বাচিত সময়কালকে প্রতিনিধিত্ব করে যার মধ্যে নিম্নবর্ণিত অনুযায়ী দুটো সময়কাল ছিল যখন পূর্ব-পশ্চিম সম্পর্ক ছিল তুলনামূলকভাবে শান্ত, চারটির ক্ষেত্রে তা' ছিল অত্যন্ত তীব্র উত্তেজনাপূর্ণ, এবং একটি সময়কালে যুদ্ধে না গিয়ে তারা বিরাট একটি সংকট সমাধানের দিকে অগ্রসর হচ্ছিলঃ

১.	জুন ২৮–২৯, ১৯৫০	কোরিয়ার যুদ্ধের সূচনা
২.	সেপ্টেম্বর ১৫–২৫, ১৯৫৯	প্রধানমন্ত্রী ক্রুশ্চেভের মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র সফর
৩.	এপ্রিল ১২–২৫, ১৯৬১	মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের কিউবা আক্রমণ
৪.	অক্টোবর ২২–২৫, ১৯৬২	কিউবার ক্ষেপণাস্ত্র সংকটের সবচেয়ে তীব্র সময়
৫.	অক্টোবর ২৬–৩১, ১৯৬২	"দর কষাকষির সময়" যা (কিউবার) ক্ষেপণাস্ত্র সংকট সমাধান করে

৬.	জুলাই ২৫–আগস্ট ৫, ১৯৬৩	মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র, সোভিয়েত ইউনিয়ন ও গ্রেট বৃটেন কর্তৃক পারমাণবিক পরীক্ষা নিষিদ্ধকরণ চুক্তি স্বাক্ষর
৭.	ফেব্রুয়ারী ৮, ১৯৬৫	মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র কর্তৃক উত্তর ভিয়েৎনামে বোমাবর্ষণের সিদ্ধান্ত

অধ্যাপক হলষ্টি উপযুক্ত নথিগুলোকে বিষয় বিশ্লেষণ করে যে উপাত্ত পান তা' নিম্নের সারণীতে দেখানো হলঃ

রাষ্ট্রীয় নীতি – গুরুত্ব আরোপকৃত (ঘটমান সংখ্যা × তীব্রতা) মোট পরিমাণ

	জুন ২৮–২৯ ১৯৫০	সেপ্টেম্বর ১৫–২৫ ১৯৫৯	এপ্রিল ১২–২৫ ১৯৬১	অক্টোবর ২২–২৫ ১৯৬২	অক্টোবর ২৬–৩১ ১৯৬২	জুলাই ২৫– আগস্ট ৫, ১৯৬৩	ফেব্রুয়ারী ৮ ১৯৬৫
সোভিয়েত ইউনিয়ন							
ধনাত্মক	৭	৭৫৪	৩৯	২৩	৬১	১০	৬
ঋণাত্মক	৪৯	২২৬	২১১	২৫৮	৮০	১০	১০৪
শক্তিশালী	৮৭	৭৪৬	২৭৯	৩৫৯	১২৬	৩৫	১৩৫
দুর্বল	৩	১১৭	২৭	১৬	২৫	৩	৩
সক্রিয়	৭৬	৫৩০	২৬৪	২৮৯	১৫৯	২১	১৩৯
নিষ্ক্রিয়	১০	২৪২	৬৩	৫৩	৫০	৫	২
চীন							
ধনাত্মক	১৬	৩১	১২৫	৩	২৭	৮৬	১
ঋণাত্মক	১২৭	৭০	১১৯৬	২৬৯	১০৪০	৭৭৪	১২৫
শক্তিশালী	১২০	১৪০	১০৫৫	২৪৩	৮১৬	৬৭৫	১১৬
দুর্বল	২	১১	৮১	১৭	৬৩	২০	২
সক্রিয়	১৪২	১১৪	৯৫৪	২১৬	৮১৮	৪৯৯	১১৫
নিষ্ক্রিয়	৮	২১	৭৫	১৮	৭৫	৫৯	২

পরিশেষে, চীন–সোভিয়েত উপলব্ধিসমূহের সমকেন্দ্রিতার উপর দুই ব্লকের মধ্যকার পারস্পরিক উত্তেজনার প্রভাব সম্পর্কিত প্রকল্প পরীক্ষার জন্য তিনি পূর্ব–

পশ্চিম দ্বন্দ্বের তীব্রতা ও হ্রাসপ্রাপ্ত অবস্থাসমূহ ভাগ করে উপাত্তকে যেভাবে একত্রে সন্নিবেশিত করেছেন তা' নিম্নের দেয়া সারণীতে দেখানো হলঃ

	দুই ব্লকের মধ্যে তীব্র বিরোধ		দুই ব্লকের মধ্যে কম বিরোধ	
	(জুন, ১৯৫০; এপ্রিল, ১৯৬১; অক্টোবর ২২–২৫, ১৯৬২; ফেব্রুয়ারী, ১৯৬৫)		(সেপ্টেম্বর, ১৯৫৯; অক্টোবর ২৬–৩১ ১৯৬২; জুলাই–আগস্ট, ১৯৬৩)	
	সোভিয়েত ইউনিয়ন	চীন	সোভিয়েত ইউনিয়ন	চীন
ধনাত্মক	৭৫ (১০·৮%)	১৪৫ (৭·৭%)	৮২৫ (৭২·৩%)	১৪৪ (৭·১%)
ঋণাত্মক	৬২২ (৮৯·২%)	১৭৪৭ (৯২·৩%)	৩১৬ (২৭·৭%)	১৮৮৪ (৯২·৯%)
শক্তিশালী	৮৬০ (৯৪·৬%)	১৫৩৪ (৯৩·৮%)	৯০৭ (৮৬·২%)	১৬৩১ (৯৪·৬%)
দুর্বল	৪৯ (৫·৪%)	১০২ (৬·২%)	১৪৫ (১৩·৮%)	৯৪ (৫·৪%)
সক্রিয়	৭৬৮ (৮৫·৭%)	১৪২৭ (৯৩·৩%)	৭১০ (৭০·৫%)	১৪৩১ (৮৯·৭%)
নিষ্ক্রিয়	১২৮ (১৪·৩%)	১০৩ (৬·৭%)	২৯৭ (২৯·৫%)	১৬৫ (১০·৩%)

বিষয় বিশ্লেষণ থেকে প্রাপ্ত উপাত্ত পরীক্ষা করলে দেখা যায় যে, কোরিয়া, কিউবা ও ভিয়েৎনামকে নিয়ে সর্বোচ্চ সংকটজনক সময়কালে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের নীতির প্রতি চীনা ও সোভিয়েত মনোভাব অনেকটা একই রকম ছিলঃ উভয়ই মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রকে মূল্যায়ন, শক্তিমত্তা ও কার্যাবলীর মাত্রাসমূহে প্রধানত ঋণাত্মক, শক্তিশালী ও সক্রিয় প্রান্তে উপলব্ধি করত। পক্ষান্তরে, যে তিনটি সময়কালে পূর্ব–পশ্চিমের উত্তেজনা কম ছিল তখন উল্লেখিত তিনটি মাত্রায়ই তীব্র উত্তেজনাপূর্ণ সময়ের চেয়ে চীনা ও সোভিয়েত উপলব্ধিতে অধিক পার্থক্য পরিলক্ষিত হয়।

বিষয় বিশ্লেষণের সমস্যাবলী

একথা বলার অপেক্ষা রাখে না যে, বৈজ্ঞানিক জ্ঞানের প্রসার মানুষের আচরণ সম্পর্কে অধ্যয়নকে অধিক সাফল্যজনকভাবে সমাধা করতে সহায়তা করে। কিন্তু তা' সত্ত্বেও

মানুষের আচরণের মত এত জটিল বিষয় সম্পর্কে ভবিষ্যদ্বাণী করা অতি দুরুহ। মানবমন সম্পর্কে অন্যান্য অধ্যয়নের মত মানুষের উদ্দেশ্য, আবেগ ও মনোভাব সম্পর্কে অবহিত হবার জন্য বিষয় বিশ্লেষণকে ব্যবহার করতে গেলেও এ সমস্যাগুলো এড়ানো প্রায় অসম্ভব। তাই বিষয় বিশ্লেষণও সমস্যামুক্ত নয়। এ সমস্যাসমূহের কিছুসংখ্যক ক্রিয়াপ্রণালীপ্রসূত যা অধিক সতর্কতা অবলম্বন করলে পুরোপুরি এড়ানো না গেলেও অনেকটা দূর করা যায়। তবে যে সমস্যাগুলো মানব প্রকৃতিতে অন্তর্নিহিত সেগুলোর সমাধান বিশেষজ্ঞদের জন্যও প্রায় অসম্ভব। নিম্নে এ সমস্যাগুলোর উপর কিঞ্চিৎ আলোকপাত করা হল।

প্রথমেই ধরা যাক ক্রিয়াপ্রণালীপ্রসূত (operational) সমস্যা যার মধ্যে পরিমাপ (measurement) বিশেষ উল্লেখযোগ্য। এর দুটো দিক আছেঃ বৈধতা (validity) ও নির্ভরযোগ্যতা (reliability)। বৈধতা নির্দেশ করে কোন একটি বিশেষ পর্যাবেক্ষণ পদ্ধতির যথার্থতা সম্বন্ধে বিভিন্ন পন্ডিত ব্যক্তি কতটুকু একমত পোষণ করেন। অন্য কথায় বলতে গেলে বৈধ পদ্ধতি হল সেই পদ্ধতি যা কোন কিছু করতে গেলে তা' সঠিকভাবে করে। বিষয় বিশ্লেষণের ক্ষেত্রে বলা যায় যে, এ পদ্ধতির মাধ্যমে যে ধারণা সম্পর্কে গবেষক উপাত্ত আহরণ করতে ইচ্ছুক তিনি যদি সংশ্লিষ্ট নথিপত্র থেকে সেটিই সমাধা করতে পারেন অর্থাৎ অন্য কোন ধারণার বিষয় যদি এখানে অনুপ্রবেশ না করতে পারে তবে সেটা বৈধ বলে পরিগণিত হবে। বৈধতা সমস্যাটির সমাধানের জন্য কিছু সুপরিচিত পদ্ধতি যথা জুরী, পরিচিত–গ্রুপ, স্বাধীন মানদন্ড ইত্যাদি ব্যবহার করা যেতে পারে।

নির্ভরযোগ্যতা বলতে সাধারণত বুঝায় পর্যবেক্ষণ পদ্ধতিতে কোন ভূল হয়ে থাকলেও তার পরিমাণ ন্যূনতম। বিষয় বিশ্লেষণের ক্ষেত্রে বলতে গেলে কোন গবেষক যে ধারণা সম্পর্কে উপাত্ত আহরণ করতে চান তিনি যদি সংশ্লিষ্ট নথিপত্র থেকে মোটামুটি সবগুলো – অর্থাৎ বেশীও না, কমও না – উদ্ধার করতে পারেন তবে তা' নির্ভরযোগ্য বলে বিবেচিত হবে। নির্ভরযোগ্যতা বাড়াতে কিছু প্রামাণ্য পরীক্ষা যথা পরীক্ষা–পুনঃপরীক্ষা (test-retest), দ্বিধাবিভক্তি (split-halves) প্রভৃতির আশ্রয় নেয়া যায়।

এভাবে ক্রিয়া প্রণালীপ্রসূত সমস্যার আংশিক সমাধান করা গেলেও মানব মনে অন্তর্নিহিত যে সমস্যা বিদ্যামান তা' দূর করা অতি দুরুহ। অধ্যাপক হলষ্টি নিজে এ ব্যাপারে যথার্থই বলেছেন যে, "সমস্যা হল যে কোন ব্যক্তির বক্তব্য ও তার অভিপ্রায়, ব্যক্তিত্ব, উদ্দেশ্য ইত্যাদির মধ্যকার সম্পর্ক বড় জোর অস্পৃষ্টভাবে অনুধাবণ করা সম্ভব হয়।"[৩৪] শুধুমাত্র যে অনেক বক্তৃতা, বিবৃতি, আত্মজীবনী প্রভৃতি সংশ্লিষ্ট ব্যক্তি নিজে না লিখে তাঁর ব্যক্তিগত সচিব অথবা অন্যান্য বিশেষজ্ঞদের দিয়ে লেখান এবং এর ফলে এগুলো পুরোপুরিভাবে তাঁর মনোভাবকে প্রতিফলিত করে না তাই নয়, "অনেক সরকারী কর্মকর্তা তাঁদের ব্যক্তিগত চিঠিপত্র এবং আত্মজীবনীতে হয় ব্যক্তিগত প্রবৃত্তিজনিত কারণে অথবা তাঁদের রীতিগত ধারণার বশবর্তী হয়ে অনেক কথাই প্রকাশ করেন না।"[৩৫]

এতে অবশ্য নিরুৎসাহিত হওয়া ঠিক নয়, কারণ সামাজিক বিজ্ঞানের গবেষণায় এ ধরণের সীমাবদ্ধতা থাকবেই। এতে সন্দেহের অবকাশ নেই যে, যেখানে বিষয় বিশ্লেষণের প্রধান লক্ষ্য হল "বক্তা অথবা লেখকের অভিপ্রায়গত, আবেগগত ও মনোভাবগত অবস্থা সম্পর্কে সিদ্ধান্তে উপনীত হওয়া" সেখানে এটা যথার্থই "স্বজ্ঞালব্ধ, বিষয়গত সংনির্ণয়ের উপর বৈজ্ঞানিক নিয়ন্ত্রণ প্রতিষ্ঠা করে।"[৩৬]

আন্তর্জাতিক সম্পর্কের গবেষণায় বিষয় বিশ্লেষণের ব্যবহার

আন্তর্জাতিক সম্পর্কের গবেষণায় বিষয় বিশ্লেষণ পদ্ধতিকে বিভিন্নভাবে ফলপ্রসূরূপে ব্যবহার করা যেতে পারে। বিষয় বিশ্লেষণের মাধ্যমেই বুঝা সম্ভব যে কোন দেশের সরকার পরিবর্তিত হলে অথবা অন্য কোন কারণে সে দেশের পররাষ্ট্র নীতিতে কোন পরিবর্তন এসেছে কিনা। উদাহরণ স্বরূপ বাংলাদেশের কথা উল্লেখ করা যেতে পারে। কোন গবেষক যদি জানতে চান যে শেখ মুজিবের মৃত্যুর পর জেনারেল জিয়া, অথবা জিয়ার মৃত্যুর পর জেনারেল এরশাদ ক্ষমতায় আসার পর বহির্বিশ্বের সাথে, বিশেষতঃ ভারত অথবা মধ্যপ্রাচ্যের মুসলিম দেশগুলোর সাথে, বাংলাদেশের সম্পর্কে কোন লক্ষণীয় পরিবর্তন এসেছে কিনা তবে এ তিন সরকারের আমলের গুরুত্বপূর্ণ নথিগুলোর বিষয় বিশ্লেষণের মাধ্যমে তিনি এ সম্পর্কে সিদ্ধান্তে পৌঁছতে পারবেন। একইভাবে আয়াতুল্লাহ্ খোমেনীর মৃত্যুর পর ইরান–ইরাক সম্পর্কের ক্ষেত্রে ইরাকের মনোভাব প্রেসিডেন্ট সাদ্দাম হোসেনের বিভিন্ন বক্তব্যের বিষয় বিশ্লেষণের মাধ্যমে বুঝা সহজ। সোভিয়েত নেতা গর্বাচেভ ক্ষমতায় আসার পর তিনি যে বক্তব্য রাখতে শুরু করেন তার সুষ্ঠু বিষয় বিশ্লেষণ করলে কোন গবেষক সোভিয়েত নীতিতে সুস্পষ্ট পরিবর্তনের আভাস লক্ষ্য করতে পারতেন।

উপরে উল্লেখিত সিদ্ধান্ত–প্রণয়ন কাঠামো ও বিষয় বিশ্লেষণ পদ্ধতির কথা মনে রেখে সংকটকালীন সময় সিদ্ধান্ত–প্রণয়ন পদ্ধতি বিশ্লেষণের উদ্দেশ্যে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের ষ্টানফোর্ড বিশ্ববিদ্যালয়ের পন্ডিতগণ যে মডেল উন্নয়ন করেছেন সেখানে বিষয় বিশ্লেষণকে কিভাবে ব্যবহার করা হয়েছে সে সম্বন্ধে সংক্ষেপে আলোচনার মাধ্যমে এ নিবন্ধের পরিসমাপ্তি করা হবে।

ষ্টানফোর্ড গ্রুপ তাঁদের গবেষণায় প্রথম বিশ্বযুদ্ধ আরম্ভ হওয়াকে কেন প্রাথমিকভাবে নির্বাচিত করলেন তার কারণ খুঁজতে গেলে বলা চলে যে, এ সম্পর্কে প্রচুর পরিমাণে সরকারী নথিপত্র প্রাপ্তিসাধ্য ছিল, এবং তদুপরি এটা সংকট তীব্রভাবে বৃদ্ধি পাবার ক্ষেত্রে একটি ধ্রুপদী উদাহরণ হিসেবে বিবেচনার যোগ্যতা রাখে।

সুনির্বাচিত বৃটিশ, ফরাসী, রুশ, জার্মান ও অষ্টো–হাঙ্গেরীয়ান সিদ্ধান্ত–প্রণেতাগণ কর্তৃক লিখিত এ ঐতিহাসিক সরকারী নথিপত্রসমূহ থেকে বিষয় বিশ্লেষণ

পদ্ধতির সাহায্যে প্ররোচণা–প্রতিক্রিয়া মডেলে ব্যবহারোপযোগী উপাত্ত আহরণ করে তাঁরা দেখিয়েছেন যে, যেসকল সামরিক ঘটনাবলী ১৯১৪ সনের সংকটের জন্য দায়ী তার মূলে সিদ্ধান্ত–প্রণেতাদের কোন ধরনের মানসিকতা কাজ করেছে এবং এ সংকট নিরূপণের জন্য তাঁদের সামনে কোন বিকল্প খোলা ছিল কিনা। এ সম্পর্কে ফারারের (L. L. Farrar, Jr.) অভিমত প্রণিধানযোগ্য। তিনি বলেন যে, রাষ্ট্রসমূহ যে নিয়ম মেনে চলে তা' দ্বারা এ সিদ্ধান্তে উপনীত হওয়া যায় যে ১৯১৪ সনের সংকট যৌক্তিক নীতি মডেলে প্রদত্ত বিবেচনার ন্যায়সংগত পরিণতিঃ

> প্রত্যেক রাষ্ট্রই তা'ই করেছে যা' ক্ষমতায় টিকে থাকার জন্য সিদ্ধান্ত–প্রণেতাদের নিকট প্রয়োজনীয় মনে হয়েছিল। সকলেই উপলব্ধি করেছিলেন যে কূটনৈতিক বিজয়, কূটনৈতিক পরাজয় ও যুদ্ধ – এর মধ্য থেকে যে কোন একটিকে বেছে নিতে হবে। সকলে কূটনৈতিক বিজয়কে অধিকতর পছন্দনীয় মনে করতেন কারণ এর মাধ্যমেই সম্ভব হত কোনরকম ঝুঁকি না নিয়েও যুদ্ধের পুরস্কার লাভ করা। কিন্তু কোন একটি রাষ্ট্র শুধুমাত্র তখনই কূটনৈতিক বিজয় লাভ করতে পারে যখন অন্য রাষ্ট্র কূটনৈতিক পরাজয় স্বীকার করে নেয়। সকলেই কূটনৈতিক পরাজয়কে প্রত্যাখ্যান করেন কারণ এর ফলে কোন রকম জয় অথবা পরাজয় ছাড়াই তাঁদেরকে সামরিক পরাজয়ের মূল্য দিতে হত। এভাবে কূটনৈতিক বিজয় অসম্ভব ছিল কারণ কূটনৈতিক পরাজয় ছিল অচিন্ত্যনীয়, কিন্তু পক্ষান্তরে যুদ্ধ ছিল কল্পনাসাধ্য। ফলস্বরূপ, যখন কোন একটিকে বেছে নেয়া একান্ত প্রয়োজনীয় বলে প্রতিভাত হয় তখন যুদ্ধ অবশ্যম্ভাবী হয়ে দাঁড়ায়।[৩৭]

১৯৬২ সনের অক্টোবর মাসের ঘটনাবলীকে, যা প্রথমে তীব্র আন্তর্জাতিক সংকটের আকার ধারণ করে বিশ্বকে যুদ্ধের দ্বারপ্রান্তে নিয়ে গিয়েছিল কিন্তু অতঃপর যুদ্ধকে এড়ানো সম্ভবপর হয়েছিল, প্রথম বিশ্বযুদ্ধ শুরুর পূর্ববর্তী কয়েক সপ্তাহের সিদ্ধান্ত–প্রণয়নের সাথে তুলনা করা যেতে পারে যদিও উভয়ের মধ্যে বৈসাদৃশ্যের ব্যাপারটিও লক্ষ্যনীয়। ১৯১৪ সনের সংকট ব্যাখ্যা করার জন্য উন্নীত মডেলের মত একই ধরনের আন্তঃক্রিয়া মডেল ব্যবহার করে হলষ্টি, ব্রডি ও নর্থ ১৯৬২ সনের কিউবার ক্ষেপণাস্ত্র সংকট সযত্নে পরীক্ষা করেন। তাঁদের প্রচেষ্টা ছিল দেখানো যে, সংকটকালীন কোন ধরনের আচরণ যুদ্ধে পরিসমাপ্তি ঘটে (যেভাবে প্রথম বিশ্বযুদ্ধ শুরু হয়) এবং কখন সংকট নিরসন সম্ভবপর হয় (যেমনটি হয়েছিল কিউবার ক্ষেপণাস্ত্র সংকটের ক্ষেত্রে)।

কিউবার ক্ষেপণাস্ত্র সংকটকালীন যে সরকারী নথিগুলোর বিষয় বিশ্লেষণ করা হয় তার মধ্যে অন্তর্ভুক্ত ছিল ১৫টি মার্কিন, ১০টি সোভিয়েত ও ১০টি কিউবান নথি। ষ্টানফোর্ডের গবেষকগণ বিষয় বিশ্লেষণের মাধ্যমে দেখতে পান যে, ১৯১৪ সনের মত ১৯৬২ সনেও পুরো সংকট পরিস্থিতিতে সিদ্ধান্ত–সময়ের উপর এমন চাপ পড়ে যা এড়ানো ছিল প্রায় অসাধ্য। তবুও প্রেসিডেন্ট কেনেডী এমন কতগুলো পদক্ষেপ নেন যা

সময়ের চাপ থাকা সত্ত্বেও অবাধ আলোচনার সুযোগ সৃষ্টি করে অনেকগুলো বিকল্প খুঁজে বের করতে সমর্থ হন এবং এ থেকে সর্বোত্তমটিকে সিদ্ধান্ত হিসেবে গ্রহণ করেন।[৩৮]

১৯১৪ সনের সংকটের সময়কার অনেক সিদ্ধান্ত প্রণেতার সাথে ১৯৬২ সনের কিউবার ক্ষেপণাস্ত্র সংকট চলাকালীন সিদ্ধান্ত–প্রণেতাদের বিরাট পার্থক্য এখানে যে শেষোক্ত সময় মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের নেতৃবৃন্দ সোভিয়েত নেতাগণ মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের কার্যাবলীকে ব্যাখ্যা করতে কিরূপ প্রবণতা দেখাতে পারেন সে ব্যাপারে যথেষ্ট চিন্তা করেছেন ও সূক্ষ্মানুভূতি দেখিয়েছেন।[৩৯] প্রেসিডেন্ট কেনেডী ও অন্যান্যরা ক্রেমলিনের নেতৃবৃন্দ যে ভুল উপলব্ধি করতে পারেন এ ধরনের সম্ভাবনা সম্পর্কে যথেষ্ট সজাগ ছিলেন। এমনকি প্রেসিডেন্ট কেনেডী পুনরায় স্মরণ করেছিলেন যে, প্রথম বিশ্বযুদ্ধ শুরু হবার পিছনে অন্যতম প্রধান কারণ ছিল প্রত্যেক দেশ কর্তৃক অন্য দেশসমূহের উদ্দেশ্য সম্পর্কে ভুল ধারণা পোষণ করা। এটা এড়ানোর জন্য তাই ক্রেমলিনের নেতৃবৃন্দকে তাঁদের নীতি পুনর্মূল্যায়নের সময় ও সুযোগ উভয়ই দেয়া হয়েছিল।[৪০] সোভিয়েত ইউনিয়নও মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের এহেন আচরণের প্রতিদানে যথেষ্ট সদিচ্ছার পরিচয় দেয়।

এভাবে ১৯১৪ সনের সংকটের সাথে ১৯৬২ সনের সংকটের তুলনামূলক আলোচনায় কমপক্ষে দুটো বিষয় পরিস্ফুট হয়ে উঠেঃ প্রথমতঃ, শেষোক্ত সময় দুই পরাশক্তির সিদ্ধান্ত প্রণেতাগণ একে অপরের মনোভাবকে অধিক সঠিকভাবে উপলব্ধি করতে পেরেছিলেন, এবং দ্বিতীয়ত, তাঁরা ১৯১৪ সনের সিদ্ধান্ত প্রণেতাদের চেয়ে সিদ্ধান্ত সময় বর্ধিতকরণের ক্ষেত্রে অধিক সংযমের পরিচয় দিয়ে সংকট নিরসনে প্রশংসনীয় ভূমিকা পালন করেন।

উপসংহার

দু'দশক পূর্বে জেমস রবিনসন হতাশা ব্যক্ত করে বলেছিলেন যে, সংকট সম্পর্কিত কোন তত্ত্ব নেই।[৪১] কিন্তু ইতোমধ্যেই স্টানফোর্ডের পন্ডিতগণ বিষয় বিশ্লেষণের মাধ্যমে উপাত্ত সংগ্রহ করে সেগুলোকে যথাযথ মডেলে ব্যবহার করে দেখিয়েছেন যে, কি কারণে কোন কোন সংকট ভয়াবহ আকার ধারণ করে যুদ্ধে রূপ নেয় এবং কিছু সংখ্যক অহিংসভাবে নিরসন করা সম্ভব হয়। তাঁদের এ গবেষণা থেকে প্রাপ্ত ফলাফল সংকটকালীন সময় সিদ্ধান্ত–প্রণেতাদের অন্তর্দৃষ্টি যোগাবে যে এরকম পরিস্থিতিতে তাঁদের কি করা উচিত। এভাবে আশা করা যায় যে, বিষয় বিশ্লেষণের মাধ্যমে উপাত্ত সংগ্রহ করে তা' যথাযথভাবে ব্যবহার করে অদূর ভবিষ্যতে আন্তর্জাতিক সম্পর্কের পন্ডিতগণ সংকটকালীন সিদ্ধান্ত–গ্রহণ সম্পর্কিত পরিপূর্ণ তত্ত্ব উদ্ভাবনে সমর্থ হবেন।

তথ্য নির্দেশ

১. James A. Robinson and Richard C. Snyder, “Decision Making in Internatinal Politics," in Herbert C. Kelman (ed), *International Behavior : A Social Psychological Analysis* (New York : Holt, Rinehart, and Winston, 1965), p. 456. Quoted in Michael P. Sullivan, *International Relations : Theories and Evidence* (New Jersey : Prentice-Hall, Inc, 1976), p. 66.

২. ঐ

৩. James E. Dougherty and Robert L. Pfaltzgraff, Jr, *Contending Theories of International Relations* (New York : Harper & Row, 1981), p. 477.

৪. দেখুন, ঐ

৫. Herbert A. Simon, *Models of Man : Social and Rational* (New York : Wiley, 1957). Quoted in Sullivan, *op. cit.*, pp. 69-70.

৬. Charles E. Lindblom, “The Science of Muddling Through," *Public Administration Review* 19 (Spring, 1959), pp. 79-88. Also in *Ibid.*, p. 70.

৭. Herbert A. Simon, *Administrative Behavior* (New York : Macmillan, 1959); “A Behavioral Model of Rational Choice", *Quarterly Journal of Econmics,* LXIX (February 1955), pp. 99-118; and “A Behavioral Model of Rational Choice", in Simon (ed), *Models of Man . . . , op. cit.*, pp. 241-260). Quoted in Dougherty and Pfaltzgraff, *op. cit.*, p. 479.

৮. Quoted in *Ibid.*, p. 474.

৯. *Ibid.*, p. 475.

১০. See Sullivan, *op. cit.*, pp. 68-69.

১১. Dougherty and Pfaltzgraff *op. cit.*, p. 480.

১২. ঐ

১৩. Bruce Russett and Harvey Starr, *World Politics: The Menu for Choice* (New York : W. H. Freeman & Co., 1989), p.266.

১৪. ঐ, পৃঃ ২৭৩

১৫. ঐ

১৬. ঐ, পৃঃ৭২

১৭. ঐ, পৃঃ ২৮৭

১৮. ঐ

১৯. Dougherty and Pfaltzgraff, *op. cit.*, p. 472.

২০. ঐ

২১. ঐ, পৃঃ ৪৭৩

২২. ঐ, পৃঃ ৪৭৪

২৩. Irving Janis, *Victims of Groupthink: A psychological Study of Foreign Policy Decisions and Fiascos* (Boston: Houghton Miffin, 1972). See K,J, Holsti, *International Politics: A framework for Analysis* (New Jersey: Prentice-Hall, 1988), p. 288.

২৪. Dougherty and Pfaltzgraff, *op. cit.*, p. 483.

২৫. Russelt and Starr, *op. cit.*, p. 274.

২৬. ঐ, পৃঃ ৩১৪

২৭. ঐ, পৃঃ ৩১৬

২৮. See, Ole R. Holsti, ``The 1914 Crisis", *American Political Science Review* 59 (June 1965); Ole R. Holsti, *Crisis, Escalation, War* (Montreal: McGill-Queens University Press, 1972); Ole R. Holsti, Richard A, Brody and Robert C. North, "Measuring Affect and Action in International Reaction Models: Empirical Materials from the 1962, Cuban Crisis," in James N. Rosenau (ed)., *International Politics and Foreign Policy : A Reader in Research and Theory* (New York : The Free Press, 1969); etc. See also, Sullivan, *op. cit.*, pp. 82-86, 288.

২৯. Alexander L. George, " Quantitative and Qualitative Approaches to Content Analysis," in Ithiel de Sola Pool (ed), *Trends in Content Analysis* (Urbana : Univ. of Illinois Press, 1959), p. 7.

৩০. Doris Muehl (ed)., A Manual for Coders (a publication of the Survey Research Center, Univ. of Michigan, Ann Arbor, Michigan, 1961) p. 9.

৩১. Bernard Berelson, *Content Analysis in Communication Research* (New York: The Free Press, 1952), p. 18

৩২. Ole R. Holsti, *Content Analysis for the Social Sciences and Humanities* (Reading, Mass.: Addison-Wesley, 1969), p.94.

৩৩. Ole R. Holsti, "External Conflict and Internal Consensus: The Sino-Soviet Case," in Philip J. Stone, Dexter C. Dunphy, Marshall S. Smith, Daniel M. Ogilvie and associates, *The General Inquirer: A Computer Approach to Content Analysis* (Cambridge, Mass.: The M. I. T. Press, 1966), pp. 343-356. For a better understanding, largerly quoted from it.

৩৪. Holsti, O. R., *Content Analysis for the op. cit.*, p. 32.

৩৫. Pool, *op. cit.*, p. 187.

৩৬. George F, Mahl, " Exploring Emotional States by Content Analysis," in Pool, *op. cit.*, p. 89 and John A. Garraty, " The Application of Content Analysis to Biography and History," in Pool, *op. cit.*, p. 185.

৩৭. L. L. Farrar, Jr., "The Limits of Choice: July 1914 Reconsidered", *The Journal of Conflict Resolution* XVI (March 1972), p . 20. Quoted in Dougherty and Pfaltzgraff, *op. cit.*, p. 492.

৩৮. Holsti, *op. cit.*, p. 288.

৩৯. ঐ, পৃঃ ২৮৯

৪০. ঐ

৪১. James A. Robinson, " An Appraisal of Concepts and Theories." in Charles F. Hermann (ed.) , *International Crises: Insights from Behavioral Research* (New York: The Free Press, 1972), p. 27: Quoted in Dougherty and Pfaltzgraff, *op. cit.*, p. 496